আমার ব্র্যাক জীবন

মতলব : গৌরবময় গবেষণার স্মৃতি

আহমদ মোশতাক রাজা চৌধুরী

মতলব : গৌরবময় গবেষণার স্মৃতি

স্বাস্থ্য এবং সার্বিক উন্নয়ন কীভাবে একে অপরের পরিপূরক তা নিয়ে প্রায়শই জ্ঞানগর্ভ আলোচনা দেখা যায়। গবেষকরা বলেন, স্বাস্থ্য যেভাবে সার্বিক উন্নয়নে বিশেষ প্রভাব রাখে ঠিক সেভাবেই সার্বিক উন্নয়নও স্বাস্থ্যের ওপর প্রভাব ফেলে। অনেকে আবার ভাবেন, স্বাস্থ্য তো সার্বিক উন্নয়নেরই একটি অংশ। সেজন্য একে অন্য উন্নয়ন সূচক থেকে আলাদা করার কোনো মানে হয় না।

১৯৯৩ সালে বিশ্বব্যাংকের একটি বিশেষ প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়, যেখানে স্বাস্থ্য ও সার্বিক উন্নয়নের সম্পর্ক নিয়ে বিশদ বিশ্লেষণ করা হয়। সেখানে বেশকিছু প্রমাণের সহায়তায় দেখানো হয়, কীভাবে স্বাস্থ্যক্ষেত্রে বিনিয়োগ সার্বিক উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করে। অবশ্য প্রতিবেদনের একটি উহ্য উদ্দেশ্য ছিল। তা হলো স্বাস্থ্যক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর বিনিয়োগ বাড়ানো। এই শেষোক্ত উদ্দেশ্যটি ওই প্রতিবেদনের মাধ্যমে কিছুটা হলেও সম্পন্ন হয়েছিল। স্বাস্থ্যক্ষেত্রে বাড়তি বৈশ্বিক মনোযোগ এবং বিনিয়োগ দুটোই কিছুটা হলেও হয়েছিল।

১৯৯৩ সালে বিশ্বব্যাংকের একটি বিশেষ প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়, যেখানে স্বাস্থ্য ও সার্বিক উন্নয়নের সম্পর্ক নিয়ে বিশদ বিশ্লেষণ করা হয়। সেখানে বেশকিছু প্রমাণের সহায়তায় দেখানো হয় যে, কীভাবে স্বাস্থ্যক্ষেত্রে বিনিয়োগ সার্বিক উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করে।

সার্বিক উন্নয়ন তথা শিক্ষা, অর্থনীতি বা নারীর ক্ষমতায়ন স্বাস্থ্যের ওপর যে প্রভাব ফেলে তার অনেক তাত্ত্বিক ও প্রায়োগিক উদাহরণও বিশ্বব্যাংকের উল্লিখিত প্রতিবেদনে ছিল। ব্র্যাকের কাজেও আমরা এর প্রতিফলন দেখেছি। যার বেশকিছু নিদর্শন ব্র্যাকের গবেষণা ও মূল্যায়ন বিভাগ থেকে উপস্থাপন করা হয়েছিল। কিন্তু উল্টোটা অর্থাৎ স্বাস্থ্যের ওপর সার্বিক উন্নয়নের প্রভাব আমরা খুব বেশি দেখাতে পারিনি। এমনকি বৈশ্বিকভাবেও এর নিদর্শন খুব একটা চোখে পড়ে না।

১৯৯২ সাল থেকে পরবর্তী প্রায় এক দশক চাঁদপুর জেলার মতলব উপজেলায় ব্র্যাক ও আইসিডিডিআর,বি যৌথভাবে এক নিবিড় গবেষণা চালায়। গবেষণা থেকে প্রাপ্ত ফল বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, ব্র্যাকের উন্নয়ন কর্মসূচির কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছেন নারীরা। শিশুমৃত্যুসহ নানা স্বাস্থ্যসূচক মাপতে এই গবেষণা বেশ প্রভাব ফেলে। এটি ছিল এক যুগান্তকারী গবেষণা, যা বিশ্বজুড়ে বিশেষ আলোড়ন তৈরি করেছিল। এ যেন উন্নয়ন গবেষণার এক উৎসব!

ব্র্যাক ও আইসিডিডিআর,বি যৌথ গবেষণা প্রকল্পের শুরুটা হয়েছিল এই উদ্দেশ্যে। ব্র্যাকের জন্য এ ধরনের একটি গবেষণা প্রকল্পের ভীষণ প্রয়োজন ছিল। ব্র্যাক নানা ক্ষেত্রে অনেক উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছিল, যার কিছু বর্ণনা বইয়ের বিভিন্ন অধ্যায়ে উপস্থাপিত হয়েছে। কিন্তু অনেকেই প্রশ্ন করতে শুরু করেন, বড় বড় কার্যক্রম চালু হয়েছে এবং তা সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়িত হয়েছে তা সত্য। কিন্তু তাতে কী? ব্র্যাক কী মানুষের জীবনে সত্যিই কোনো প্রভাব ফেলতে পেরেছে? আয় কী বেড়েছে? স্কুলে মেয়েরা কী বেশি বেশি শিখছে? নারীদের অবস্থার উন্নতি কী হয়েছে? শিশুমৃত্যু হার কী কমেছে? ইত্যাদি।

প্রায়শই এ ধরনের নানা প্রশ্নের মুখোমুখি হয়েছি। খাবার স্যালাইন তো নানাভাবে একটি সফল প্রকল্প হিসেবে দেশে-বিদেশে খ্যাতি অর্জন করেছিল। দুঃখজনকভাবে শিশুমৃত্যুর ওপর এই প্রকল্পের প্রভাব প্রশ্নাতীতভাবে নির্ধারণ করা যায় নি। অবশ্য তার একটি কারণ ছিল শিশুমৃত্যুর প্রকৃত কারণ সুনির্দিষ্ট করতে পারার অপারগতা। আমাদের দেশে পশ্চিমা দেশগুলোর মতো ভাইটাল রেজিস্ট্রেশন পদ্ধতি প্রচলিত নয়। সে কারণে জন্ম বা মৃত্যু কোনটিই রেকর্ড বা লিপিবদ্ধ করা হয় না। তা ছাড়া মৃত্যুর কারণ নির্ণয় করা এক বিশেষায়িত কাজ, যা সাধারণভাবে যাচাই করা খুবই কঠিন এবং ঝুঁকিপূর্ণ। এসব কারণে ব্র্যাকের কাজের প্রকৃত প্রভাব নিরূপণ অনেকটা অপরিহার্য হয়ে পড়েছিল।

আইসিডিডিআর,বি-র সমাজবিজ্ঞানী আব্বাস ভূইয়ার সঙ্গে আমার অনেকদিনের পরিচয়। আমার মতো সেও পরিসংখ্যানবিদ এবং ডেমোগ্রাফার। স্ট্যান ডি'সুজার মাধ্যমে তার সঙ্গে পরিচয় ও ঘনিষ্ঠতা। ডি'সুজা আমাদের দুজনকে খুবই পছন্দ করতেন এবং আমরা একসঙ্গে যেন কাজ করি তা চাইতেন। আমার পিএইচডি-র মাঠপর্যায়ের কাজের সময় আব্বাস এবং তার সহকর্মী কেএমএ আজিজ ও মিজানুর

রহমানের সঙ্গে পরিচয় হয়। আমার গবেষণা লব্ধ ‘চার ডায়রিয়া তত্ত্ব’ তাদের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল।

আশির দশকের শেষদিকে আব্বাস ভূইয়া অস্ট্রেলিয়া থেকে দেশে ফিরে এলে আমরা পেশাগত এবং সামাজিকভাবে প্রায়ই মিলিত হতাম। আব্বাস ভূইয়ার সঙ্গে একসঙ্গে শেষ করেছি, যেগুলোর কিছু কিছু দিক এখানে আলোচনায় আসবে। সার্বিক উন্নয়ন যেমন দারিদ্র্যবিমোচন বিষয়ে তার ভীষণ আগ্রহ লক্ষ্য করি। এরই রেশ ধরে আমরা মতলবে নতুন কিছু করার কথা ভাবতে শুরু করি, যেখানে ব্র্যাক ও আইসিডিডিআর,বি যৌথভাবে কাজ করতে পারে। একটি ধারণাপত্র তৈরি হলে আব্বাস ভূইয়া সেটি আইসিডিডিআর,বি-র সাসাকাওয়া মিলনায়তনে প্রতিষ্ঠানের সকল কর্মীর কাছে উত্থাপন করে। আমাদের পরিকল্পনা শুনে হৈ চৈ পড়ে গেল।

উন্নয়ন কার্যক্রমের প্রভাব এবং তা পরিমাপ করার বিষয়ে তার আগ্রহ ছিল প্রচুর। আইসিডিডিআর,বি-র মতলব প্রকল্প এ বিষয়ে আমাদেরকে আরও কাছাকাছি নিয়ে এলো। ১৯৬১ সাল থেকে মতলবে আইসিডিডিআর,বি একটি ডেমোগ্রাফিক সার্ভেইলেন্স চালিয়ে আসছিল। এর মাধ্যমে ২শ গ্রামের প্রতিটি লোকের বিস্তারিত তথ্য রেকর্ড করা হয়। তথ্যের মধ্যে ছিল জন্ম, মৃত্যু, অভিবাসন, বিয়েসহ সব ভাইটাল ইভেন্টস।

আমরা তখন ভাবলাম, মতলবে ব্র্যাকের প্রভাব দেখার এটি একটি সুবর্ণ সুযোগ। কিন্তু তখনও মতলবে ব্র্যাকের কোনো কার্যক্রম ছিল না। আইসিডিডিআর,বি-র কর্মএলাকায় ব্র্যাকের কার্যক্রম শুরু হলে প্রথম বাধা যে আসবে খোদ আইসিডিডিআর,বি-র কাছ থেকে, সে ব্যাপারে আমরা নিশ্চিত ছিলাম। আইসিডিডিআর,বি-র বিজ্ঞানীরা একটি ভ্রান্ত ধারণা নিয়ে বসেছিলেন যে, সঠিক বৈজ্ঞানিক কাজ করতে হলে মতলবকে নতুন কোনো ইন্টারভেনশন থেকে রক্ষা করতে হবে। তাদের ধারণা এসব ইন্টারভেনশন তাদের গবেষণাক্ষেত্র দূষিত বা পল্যুটেড করবে এবং সেখানে আর বিজ্ঞানবৃত্তি হবে না। কিন্তু এই নীতি বা ধারণা যে নৈতিকতার সম্পূর্ণ লঙ্ঘন, তা তাদেরকে কে বোঝাবে?

১৯৬১ সাল থেকে মতলবে আইসিডিডিআর,বি একটি ডেমোগ্রাফিক সার্ভেইলেন্স চালিয়ে আসছিল। এর মাধ্যমে ২শ গ্রামের প্রতিটি লোকের বিস্তারিত তথ্য রেকর্ড করা হয়। তথ্যের মধ্যে ছিল জন্ম, মৃত্যু, অভিবাসন, বিয়েসহ সব ভাইটাল ইভেন্টস।

আমরা বুঝেছিলাম ওই বিজ্ঞানীদের মুখোমুখি হতে হলে আরও ওপরের স্তরের কারও কারও সমর্থন প্রয়োজন। সে সময় আইসিডিডিআরবি,র পরিচালক ছিলেন ডেমিসি হাবতে। তিনি ইথিওপিয়ার মানুষ এবং আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত একজন শিশু বিশেষজ্ঞ ও জনস্বাস্থ্যবিদ। স্বাস্থ্য গবেষণা বিষয়ে এক আন্তর্জাতিক কমিশনের সদস্য হওয়ার কারণে হাবতে ও স্যার ফজলে হাসান আবেদ ঘনিষ্ঠ ছিলেন। আস্তে আস্তে তাদের মধ্যে বন্ধুত্বও গড়ে ওঠে।

আব্বাস ভূইয়া এবং আমি মনে করলাম ঐ বন্ধুত্বই মোক্ষম একটি সুযোগ এবং তা কাজে লাগাতে হবে। প্রথমেই আবেদ ভাইয়ের সঙ্গে কথা বললাম। স্বাভাবিকভাবেই তিনি খুব উৎসাহী হলেন। এরই মধ্যে লন্ডন থেকে বৃটিশ এয়ারওয়েজ-এর একই বিমানে আবেদ ভাই আর হাবতে ফিরছিলেন। ভূপৃষ্ঠ থেকে তেত্রিশ হাজার ফুট উচ্চতায় গল্পের ফাঁকে আবেদ ভাই হাবতেকে ব্র্যাকের মতলবে যাওয়ার বিষয়ে বললেন। সঙ্গে সঙ্গেই হাবতে রাজি। একটি বিরাট বিজয় হলো। কিন্তু আরও অনেক কিছুই করা বাকি। আইসিডিডিআরবি,র দেশি-বিদেশি বিজ্ঞানীদের অনেকেই তখনও এর বিপরীতে এবং ঘোর বিরোধী। হাবতে বললেন, আমরা যেন আমাদের পরিকল্পনা তার প্রতিষ্ঠানের সিনিয়র ম্যানেজমেন্ট ফোরাম 'কাউন্সিল অব অ্যাসোসিয়েট ডাইরেক্টরস'-এর কাছে পেশ করি।

স্বাস্থ্য গবেষণা বিষয়ে এক আন্তর্জাতিক কমিশনের সদস্য হওয়ার কারণে হাবতে ও স্যার ফজলে হাসান আবেদ ঘনিষ্ঠ ছিলেন। আস্তে আস্তে তাদের মধ্যে বন্ধুত্বও গড়ে ওঠে।

অনেক প্রস্তুতি নিয়ে একদিন তাদের সঙ্গে বসলাম। সেখানে আমরা এমন এক কৌশল তুলে ধরলাম যে বিজ্ঞানীদের আর বিরুদ্ধাচরণ করার কোনো সুযোগ বা অবকাশ থাকল না। আমি বাংলাদেশের উপজেলার মানচিত্র দেখালাম। সেখানে ব্র্যাকের নানা কার্যক্রম চলমান ছিল। বললাম, ব্র্যাক তার কার্যক্রম দেশের উত্তর এবং মধ্য অঞ্চলের প্রায় সব উপজেলায় সম্প্রসারিত করেছে। এখন তাদের 'নিচের' দিকে যাওয়ার পালা। মতলব সেই রাস্তায় পড়বে। এও বললাম, মতলবে যাওয়ার সকল প্রস্তুতি শেষ। এ ব্যাপারে সরকারের অনুমোদনও পাওয়া গেছে। আমরা যদি মতলবকে বাদ দেই তবে তা হবে অনৈতিক বা আনএথিক্যাল। নৈতিকতার কোনো মাপকাঠিতে আমরা তার সমর্থন পাব না।

ব্র্যাক মতলবে কার্যক্রম শুরু করলে আইসিডিডিআর,বি কীভাবে লাভবান হবে সে বিষয়ও তুলে ধরলাম। গবেষণার নতুন নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হওয়া ছাড়াও এর মাধ্যমে আইসিডিডিআর,বি পৃথিবীতে নতুনভাবে আবির্ভূত হবে। নতুন নতুন তহবিলও আসবে। দারিদ্র্যতা নামক রোগের বিরুদ্ধে কাজ করার সুযোগ ঘটবে। খুবই সফল একটি সভা হল।

এরপর আর পেছনে ফিরে তাকাতে হয়নি। সে সময় ঢাকাস্থ ফোর্ড ফাউন্ডেশনের প্রোগ্রাম অফিসার ছিলেন নৃবিজ্ঞানী জিম রস। মতলবের এই গবেষণায় তারও প্রচণ্ড আগ্রহ ছিল। সেজন্য সহজেই অনেক বড় একটি অনুদান পেয়ে গেলাম। দু'টি প্রতিষ্ঠান ব্র্যাক ও আইসিডিডিআর,বি এক কাতারে, সঙ্গে ফোর্ড ফাউন্ডেশন। পরবর্তীতে জিম রস ফোর্ড ফাউন্ডেশন ছেড়ে আরেকটি বড় অনুদান নিয়ে নিজেই আইসিডিডিআর,বি-তে যোগ দেন। মনে হচ্ছিল তিনি নিজেই এই গবেষণা প্রকল্পের দায়িত্ব নিতে চান। ব্র্যাক ও আইসিডিডিআর,বি আমাদের সমর্থনে ছিল বলে সেটা আর সম্ভব হয়ে ওঠেনি।

মনে পড়ে এ ধরনের আরেক পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল নব্বই দশকের শেষার্ধে। ব্র্যাকের পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচির প্রভাব নির্ণয়ে আমরা একটি গবেষণা কার্যক্রম শুরু করি। এতে টেকনিক্যাল অ্যাসিস্ট্যান্স-এর জন্য নিয়োগ দেওয়া হয় যুক্তরাজ্যের ইস্ট এংলিয়া ইউনিভার্সিটিকে। ব্র্যাকের এক দাতার পরামর্শে ইস্ট এংলিয়াকে এ কাজে যুক্ত করা হয়েছিল। বলে রাখি, এই দাতা সংস্থার ঢাকাস্থ অফিসের একজন কর্মকর্তা ছিলেন ইস্ট এংলিয়ার প্রাক্তন শিক্ষক।

গবেষণার মাঠ পর্যায়ের কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার পর যখন উপাত্তসমূহ বিশ্লেষণ করার কাজ শুরু হবে, তখনই দাতাদের পক্ষ থেকে বলা হলো, গবেষণার সমস্ত প্রাথমিক তথ্য-উপাত্ত আমরা যেন যুক্তরাজ্যের বিশ্ববিদ্যালয়টিতে পাঠিয়ে দেই। তারাই উপাত্তের বিশ্লেষণ করে প্রতিবেদন তৈরি করবেন। এই প্রস্তাবনাকে নব্য আধিপত্যবাদের নমুনা বলে মনে হলো। আমরা এর প্রতিবাদ করি এবং উপাত্তসমূহ তাদেরকে দেওয়া থেকে বিরত থাকি।

ব্র্যাকের পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচির প্রভাব নির্ণয়ে আমরা একটি গবেষণা কার্যক্রম শুরু করি। এতে টেকনিক্যাল অ্যাসিস্ট্যান্স-এর জন্য নিয়োগ দেওয়া হয় যুক্তরাজ্যের ইস্ট এংলিয়া ইউনিভার্সিটিকে।

ব্র্যাকের গবেষণা ও মূল্যায়ন বিভাগের (আরইডি) বিশ্লেষণের ক্ষমতা নিয়েও তারা প্রশ্ন উথাপন করেছিল। আমরা সেই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে যথাসময়ে একটি সারগর্ভ প্রতিবেদন তৈরি করেছিলাম, যা বেশ সুনাম কুড়িয়েছিল। প্রতিবেদন তৈরিতে যারা যুক্ত ছিলেন তাদের মধ্যে শামস মোস্তফা, মোয়াজ্জেম হোসেন, দিলরুবা বানু এবং হালদার ছিলেন অন্যতম। উচ্চতর পর্যায়ে আমাদের অকুণ্ঠ সমর্থন জুগিয়েছিলেন আবেদ ভাই এবং ফোর্ড ফাউন্ডেশনের রে অফেনহাইজার।

মতলবের নতুন গবেষণা কাজে ব্র্যাক ও আইসিডিডিআর,বি প্রস্তুত। আপাতত তহবিলেরও কোনো সমস্যা নেই। গবেষকদের একটি দলও তৈরি। এই প্রকল্পের জন্য শক্তিশালী মাল্টি-ডিসিপ্লিনারি গবেষক দল তৈরি হয়েছিল। এই দলে জনস্বাস্থ্য, জনমিতি, পরিসংখ্যান, নৃবিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান, অর্থনীতি, পুষ্টিবিজ্ঞান, জেন্ডার, শিক্ষাসহ সব ধরনের গবেষক ছিলেন। প্রকল্পের আরেকটি ভালো দিক ছিল গবেষকদের এক নতুন প্রজন্মের আত্মপ্রকাশ। প্রায় চল্লিশজন উদীয়মান দেশি-বিদেশি গবেষক নানা সময়ে এই প্রকল্পে জড়িত ছিলেন। এদের অনেকেই পরবর্তীতে পিএইচডি ও উচ্চতর ডিগ্রি অর্জন করে পৃথিবীর নানা দেশে উন্নয়নের নানা ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছে। গবেষণা দলের সকল সদস্য প্রতি সপ্তাহে মিলিত হয়ে কাজের পর্যালোচনা এবং নতুন চ্যালেঞ্জসমূহ কীভাবে সমাধান করা যায়, তা নিয়ে আলেচনা করত। এসব উদ্যোগের মাধ্যমে দলের সদস্যদের গবেষণা কর্মে ক্যাপাসিটি বিল্ডিং হতো।

পরবর্তী চ্যালেঞ্জ হলো গবেষণা ডিজাইন। অনেক আলোচনা পর্যালোচনার পর ঠিক হলো এটি হবে একটি 'চার সেল' ডিজাইন। মতলবের গ্রামগুলোকে চারটি ভাগে ভাগ করা হবে। যেমন : যেখানে শুধু ব্র্যাক উপস্থিত, যেখানে শুধু আইসিডিডিআর,বি উপস্থিত, যেখানে দু'টি সংস্থাই উপস্থিত আর যেখানে দুটি প্রতিষ্ঠানই অনুপস্থিত। একটি বেঞ্চমার্ক সার্ভের মাধ্যমে কাজ শুরু এবং তারপর প্রতি ছয়মাস অন্তর এর পুনরাবৃত্তি। মাঝখানে অনবরতভাবে চলবে নৃতাত্ত্বিক অন্বেষণ। আমরা যে শুধুই প্রভাব নির্ণয় করতে চাই তা নয়, সঙ্গেসঙ্গে জানতে হবে কেনইবা এই প্রভাব ঘটল। সেটি ইতিবাচক বা নেতিবাচকই হোক।

মতলবে ব্র্যাকের কার্যক্রম শুরু ক্ষুদ্রঋণ এবং উপানুষ্ঠানিক স্কুল দিয়ে। গ্রাম পর্যায়ে আইসিডিডিআর,বি-র স্বাস্থ্য কর্মসূচি বিদ্যমান থাকায় ব্র্যাক স্বাস্থ্য কার্যক্রম থেকে বিরত থাকে। প্রতিটি কার্যক্রম পরিচালনার জন্য আলাদা আলাদা কর্মীবাহিনী রয়েছে। ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম শুরু হয় গ্রাম সমিতির মাধ্যমে। শুধুমাত্র নারীরাই এই সমিতির সদস্য।

মনজুরুল মান্নান আমাদের গবেষকদের একজন। পড়াশোনা করেছেন নৃবিজ্ঞানে। একটি গ্রাম সমিতিতে শুরুর দিকে কীভাবে কাজ হয়, ব্র্যাককর্মীরা গ্রামের নারীদের সঙ্গে কীভাবে যোগাযোগ করেন, কীভাবে তাদের সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করেন, সেসব বিষয় নিয়ে তিনি একটি গবেষণাপত্র তৈরি করেন। বাইরে থেকে যাওয়া ব্র্যাককর্মীদের সঙ্গে গ্রামের স্বল্প শিক্ষিত নারীদের আদানপ্রদান এবং মতবিনিময় (ইন্টারেকশন) কীভাবে শুরু হয় এবং আস্তে আস্তে সম্ভাব্য সদস্যদের নিয়ে কীভাবে সমিতি গঠন হয়, পুরো বিষয়টিই গবেষণার মাধ্যমে বেরিয়ে এলো। অজানা সন্দেহ, অবিশ্বাসের বিপরীতে আশা-আকাঙ্ক্ষা কীভাবে দানা বাঁধে, তা এই গবেষণায় সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছিল।

ব্র্যাককর্মীরা গ্রামের নারীদের সঙ্গে কীভাবে যোগাযোগ করেন, কীভাবে তাদের সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করেন, সেসব বিষয় নিয়ে তিনি একটি গবেষণাপত্র তৈরি করেন।

তিরিশটি গ্রাম নিয়ে ব্র্যাকের কার্যক্রমের সূত্রপাত হয়েছিল। মতলব শহরের একটি ভাড়া বাসায় প্রথম অফিস খোলা হয়। হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ফিরে আমি যখন প্রথম মতলবে গেলাম তখন সেই অফিসের ব্যবস্থাপক চন্দ্রশেখর ঘোষের সঙ্গে পরিচয় হলো। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিসংখ্যান বিভাগের প্রাক্তন ছাত্র। সেই হিসেবে তার সঙ্গে আমার অনেক মিল। খুব দ্রুতই পরস্পরকে জানা হয়ে গেল। লক্ষ্য করলাম, কাজের প্রতি তার অদম্য নিষ্ঠা এবং অমায়িক ব্যবহার। ব্র্যাক এবং গবেষণা দলের সদস্যদের প্রতি তার ভীষণ শ্রদ্ধা। তখন বুঝতে পারিনি এই চন্দ্রশেখর ঘোষ একদিন ভারতের 'বন্ধন ব্যাংক'-এর প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান নির্বাহী হবে।

ব্র্যাক ছেড়ে পরবর্তী সময়ে চন্দ্রশেখর ঘোষ ভারতে চলে যায় এবং ব্র্যাকের অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে 'বন্ধন' নামে একটি ক্ষুদ্রঋণ সংগঠন চালু করে। অচিরেই তা এক বিশাল মহীরুহে পরিণত

হয় এবং ভারতের সর্ববৃহৎ ক্ষুদ্রঋণদানকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে স্বীকৃতি পায়। কিন্তু শেখর সেখানেই থেমে থাকেনি। ২০১৫ সালে ভারতের সব বাঘা বাঘা ধনী যেমন বিড়লা ও আম্বানিদের টেক্কা দিয়ে সে ব্যাংকের লাইসেন্স পায়। ‘বন্ধন ব্যাংক’ এখন ভারতের সপ্তম বৃহত্তম ব্যাংক, যার গ্রাহক সংখ্যা প্রায় দুই কোটি এবং শাখার সংখ্যা হাজারেরও বেশি। চন্দ্রশেখর ঘোষ এখন শুধু একটি নাম নয়, একটি স্বপ্নও বটে। কলকাতার সল্টলেক এলাকায় বন্ধন-এর বিশাল প্রধান কার্যালয়ে গেলে চোখে পড়বে দেশে-বিদেশ থেকে পাওয়া বিপুলসংখ্যক স্বীকৃতি এবং পুরস্কার। ভারত বিভক্তির পর পশ্চিমবঙ্গসহ সমস্ত পূর্ব ভারতে স্থাপিত এটিই প্রথম ব্যাংক। চন্দ্রশেখর ঘোষের প্রতি রইল শুভাষীস ও শুভ কামনা।

১৯৯২ সালের জুন মাসে মতলবে বেজলাইন সার্ভে শুরু হয়। একই বছরের আগস্ট মাসে আমি হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে যাই ম্যাকআর্থার ফেলো হিসেবে। লিঙ্কন চেন হার্ভার্ড সেন্টার ফর পপুলেশন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ-এর পরিচালক। ম্যাকআর্থার প্রোগ্রামটি এই সেন্টারেই অবস্থিত। এক বছর স্থায়ী এই ফেলোশিপ আমার জীবনের এক বিশেষ মাইলফলক। সেখানে অনেক নামি ও গুণী মানুষের সঙ্গে পরিচয় এবং কাজ করার সুযোগ হয়। সেখান থেকেই আমার প্রথম বই `A Simple Solution’-এর কাজ শুরু। হার্ভার্ডে থাকতেই আমাদের উদ্ভাবিত শিক্ষা গবেষণার নতুন পদ্ধতি `Assessment of Basic Competencies’ বা ABC একটি আন্তর্জাতিক সাময়িকীতে প্রকাশিত হয়।

মতলবের যৌথ প্রকল্প নিয়েও সেখানে অনেকের সঙ্গে আলোচনা হয়। লক্ষ্য করলাম, সকলেই ভীষণ উৎসুক এবং আগ্রহী। অনেকে বললেন, এটা ঠিকমতো করা গেলে সামাজিক বিজ্ঞান গবেষণায় তা এক নতুন দিক্‌নির্দেশনা দেবে। লিঙ্কন চেন-এর সঙ্গে প্রকল্প নিয়ে আলোচনা করার সময় তিনি বললেন, প্রকল্পের যে রূপরেখা তৈরি করা হয়েছে, তা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। আমার হার্ভার্ডে উপস্থিতি কীভাবে একে এগিয়ে নিতে সহায়তা করতে পারে, তা নিয়েও ভাবতে বললেন।

ম্যাকআর্থার ফেলো হিসেবে আমরা প্রায় ৯-১০ জন ছিলাম। পৃথিবীর নানা দেশ থেকে তারা এসেছেন। বাংলাদেশ থেকে আরও ছিলেন বিআইডিএস-এর সিমিন মাহমুদ এবং বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর রীতি ইব্রাহিম। কাকতালীয়ভাবে আমরা তিনজনই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিসংখ্যান বিভাগের প্রাক্তন শিক্ষার্থী। আরও ছিলেন বার্মার নিন নিন পাইন এবং কানাডীয় দম্পতি এলেনা অ্যাডামস ও টিম ইভান্স। এদের প্রায় সকলের সঙ্গেই আমার এবং আমার পরিবারের সখ্যতা গড়ে ওঠে। এলেনা এবং টিম এখনও আমাদের নিত্যদিনের বন্ধু। টিম ইভান্স ফেলোশিপের সঙ্গেসঙ্গে হার্ভার্ড মেডিকেল স্কুলে এমডি পড়ছিল, তাই তার সঙ্গে কদাচিৎই দেখা হতো। এলেনা মতলব প্রকল্প নিয়ে ভীষণ আগ্রহী ছিল।

মতলব প্রকল্পের রূপরেখা এবং গবেষণা পদ্ধতি নিয়ে একটি আন্তর্জাতিক কর্মশালা করার কথা তখনই ভাবতে শুরু করি। সঙ্গে যুক্ত হয় এলেনা। দুজনে মিলে লিঙ্কন চেন-এর সঙ্গে আলাপ করলাম এবং তিনি সঙ্গেসঙ্গে সায় দিলেন। লিঙ্কন বললেন, কর্মশালা করতে যে ব্যয় হবে সেটা তিনি সেন্টারের মাধ্যমেই ব্যবস্থা করবেন। এলেনা আর আমি কাজে লেগে গেলাম। কয়েক মাস অক্লান্ত পরিশ্রমের পর

সেই মাহেন্দ্রক্ষণ ঘনিয়ে এলো। ১৯৯৩ সালের জুন মাস। হার্ভার্ডের ডিভিনিটি ইনস্টিটিউটে হলো দু'দিনের কর্মশালা। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ছাড়াও পৃথিবীর অন্য দেশ থেকেও অনেকেই এই কর্মশালায় অংশ নিয়েছিলেন।

বাংলাদেশ থেকে যোগ দিলেন ব্র্যাকের ফজলে হাসান আবেদ ও সাদিয়া আফেরোজ চৌধুরী, আইসিডিডিআর,বি-র মাইকেল স্ট্রং ও আব্বাস ভূইয়া এবং ফোর্ড ফাউন্ডেশনের জিম রস। তাদের থাকার ব্যবস্থাও করতে হলো। জিম রস তার এক বন্ধুর বাসায় উঠলেন। সাদিয়া চৌধুরী আমাদের কনকর্ড এভিনিউর ছোট অ্যাপার্টমেন্টে থাকলেন। আবেদ ভাই এবং আব্বাসের জন্য একটি বুটিক হোটেলের ব্যবস্থা করা হলো। বোস্টনের লোগান এয়ারপোর্টে সকলকে স্বাগত জানিয়ে যার যার গন্তব্যে পৌঁছে দিলাম।

আবেদ ভাইয়ের খোঁজ নেওয়ার জন্য বিকেলে তাঁর হোটেলে গেলাম। সেখানে গিয়ে বুঝতে পারলাম কিছু একটা সমস্যা হয়েছে। আবেদ ভাই বললেন, হোটেলটি 'ধুমপানমুক্ত'। তাই মাঝে মাঝেই তাঁকে হোটেলের বাইরে যেতে হচ্ছে। শুনে মনে হলো এটি একটি বিড়ম্বনাই বটে এবং আমার আগে থেকেই তা বোঝা উচিত ছিল। আবেদ ভাই বললেন, অসুবিধা নেই, ম্যানেজ করে নেব। কিন্তু আমি মানতে পারলাম না। বের হয়ে গেলাম অন্য হোটেলের সন্ধানে, যেখানে অন্তত নিয়মকাননের এত কড়াকড়ি নেই। পেয়েও গেলাম। পরদিনই আবেদ ভাইকে নতুন হোটেলে স্থানান্তর করলাম।

প্রসঙ্গক্রমে বলে রাখি, আবেদ ভাই বরাবরই ধুমপায়ী। অন্ততঃ আমি যতদিন দেখেছি। প্রথমদিকে তাঁর পছন্দ ছিল পাইপ এবং সিগার। মনে আছে একবার কিউবা থেকে তাঁর জন্য হাভানা চুরুট এনেছিলাম। পরিবার এবং আপনজনদের চাপে মাঝে মাঝে তিনি ধুমপান ছেড়ে দিতেন। আবার কোনো কারণে উত্তেজনা বা টেন্স হলেই ধুমপান শুরু করতেন। জীবনের শেষ কয়েকটি দিনও তিনি ধুমপান করেছেন। মৃত্যুর কিছুদিন আগে তাঁকে বলেছিলাম, আবেদ ভাই, আপনি আবার সিগারেট ধরেছেন? উত্তরে বললেন, 'কিইবা লাভ? সিগারেট খেলেও চার মাস, না খেলেও চার মাস। তার চাইতে বরং খেয়েই যাই। তাতে অন্তত কিছুটা পরিতৃপ্তি তো পাব।'

১৯৯৩ সালের জুন মাস। হার্ভার্ডের ডিভিনিটি ইনস্টিটিউটে হলো দু'দিনের কর্মশালা। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ছাড়াও পৃথিবীর অন্য দেশ থেকেও অনেকেই এই কর্মশালায় অংশ নিয়েছিলেন।

হার্ভার্ড ডিভিনিটি স্কুলে কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছিল। আমাদের আহ্বানে সাড়া দিয়ে সামাজিক বিজ্ঞান গবেষণার প্রায় চল্লিশজন বরেণ্য ব্যক্তিত্ব সেখানে অংশ নিয়েছিলেন। এদের মধ্যে ছিলেন ডেভিড বেল, সুধীর আনন্দ, গীতা সেন, অমর্ত্য সেন, লিঙ্কন চেন, মার্টি চেন, রিচার্ড ক্যাশ, হুলিও ফ্র্যাঙ্ক, লিসা বার্কম্যান, জন রোডি, মাইকেল ব্যানিশ, রবার্ট চেম্বার্স, জেন ম্যানকেন, মনিকা দাসগুপ্ত প্রমুখ।

কর্মশালা মোট চারটি সেশনে বিস্তৃত ছিল। এতে চারটি মূল প্রবন্ধ পেশ করা হয়। মতলব প্রকল্পের মূল গবেষণা রূপরেখা তৈরি করার সময় নারীর ক্ষমতায়নের বিষয়টি কীভাবে পরিমাপ করা যায়, সে বিষয়ের ওপর বিশেষভাবে জোর দেওয়া হয়েছিল। এ বিষয়ক প্রতিবেদনটি তৈরি করেছিলেন সিমিন মাহমুদ এবং মার্টি চেন। কর্মশালার দ্বিতীয় দিনে অমর্ত্য সেন অংশগ্রহণকারী সকলকে হার্ভার্ড ক্লাবে মধ্যাহ্নভোজে আপ্যায়িত করেছিলেন।

হার্ভার্ডে এক বছর কাটিয়ে ফিরে এলাম ঢাকায়। মতলব প্রকল্প তখন আমার এক প্রধান অগ্রাধিকার। জুন মাসের কর্মশালা আমার মনে প্রচণ্ডভাবে রেখাপাত করেছিল এবং তখনই এর অমিত সম্ভাবনা দেখেছিলাম। ফিরে এসে আব্বাস ভূইয়ার সঙ্গে মিলে নতুন করে আবার পরিকল্পনা করলাম। ঠিক হলো, ব্র্যাকের প্রভাব দেখতে হলে আমাদের অবস্থান সেখানে আরও নিবিড় এবং দীর্ঘতর করতে হবে। আসলে গ্রামে কী হচ্ছে তা দেখার জন্য দরকার চব্বিশ ঘণ্টা গ্রাম পর্যায়ে উপস্থিতি এবং পর্যবেক্ষণ। উদ্দমদী গ্রামে একটি নিবিড় পর্যবেক্ষণ ক্যাম্প স্থাপিত হলো।

সার্বক্ষণিক কয়েকজন মাঠ গবেষক ওই ক্যাম্পে থাকতেন। এদেরই একজন সাবিনা ফয়েজ রশিদ। সবেমাত্র অস্ট্রেলিয়া থেকে নৃবিজ্ঞানে ডিগ্রি নিয়ে এসেছে। ভাঙা ভাঙা বাংলায় কথা বলে। তাকে বললাম, ওই গ্রামে ব্র্যাকের দুটো উপানুষ্ঠানিক স্কুল আছে। এর মধ্যে একটি খুবই ভালো চলছে, কিন্তু আরেকটি বেশ সমস্যায় আছে। এর কারণ বের করতে হবে। তিনমাস গবেষণার পর সে অনেকগুলো কারণ বের করল, যা ব্র্যাকের শিক্ষা কার্যক্রমকে সঠিক পথে এগিয়ে নিতে অসাধারণ ভূমিকা রেখেছিল।

'ভিলেজ পলিটিক্স'-এর কথা ছোটবেলায় শুনেছি। এখানে দেখলাম, 'ভিলেজ পলিটিক্স' স্কুলের মতো নিরপেক্ষ প্রতিষ্ঠানে কীভাবে তার কালোছায়া বিস্তার করতে পারে। ব্র্যাক স্কুলে সাধারণত একজন শিক্ষক থাকেন এবং তিনি ওই গ্রামেরই বাসিন্দা। উদ্দমদীতে শিক্ষক নিয়োগ দেওয়ার ক্ষেত্রে ব্র্যাক স্থানীয় ক্ষমতাধরদের পাত্তা দেয়নি বলেই 'ভিলেজ পলিটিক্স'-এর মাধ্যমে সমস্যা তৈরি করা হয়েছিল।

সত্তর দশকে মতলবে একটি গবেষণায় দেখা গিয়েছিল যে, পরিবারে মেয়েদের চাইতে ছেলেদেরকে উন্নতমানের খাবার বেশি পরিমাণে দেওয়া হয়। লিঙ্কন চেন ও এমদাদুল হকের যৌথ গবেষণা বাংলাদেশের সমাজে জেন্ডারবৈষম্য কীভাবে বিদ্যমান তার একটি দলিল।

পুষ্টি সংক্রান্ত আরেকটি গবেষণা হয়েছিল। সত্তর দশকে মতলবে একটি গবেষণায় দেখা গিয়েছিল যে, পরিবারে মেয়েদের চাইতে ছেলেদেরকে খাবার বেশি পরিমাণে দেওয়া হয়। লিঙ্কন চেন ও এমদাদুল হকের যৌথ গবেষণা বাংলাদেশের সমাজে জেন্ডারবৈষম্য কীভাবে বিদ্যমান তার একটি দলিল। এই বৈষম্যের ফলে মেয়েরা পুষ্টিগতভাবে ছেলেদের চাইতে দুর্বল হয়ে বেড়ে ওঠে, যা পরিণত বয়সেও থেকে যায়। ব্র্যাকের ক্ষুদ্রঋণ ও উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কর্মসূচির মূল সুবিধাভোগী হলো নারী। এসব কর্মসূচি বৈষম্য কমাতে কোনো অবদান রাখতে পারে কিনা তা আমরা গবেষণার মাধ্যমে দেখতে চেয়েছিলাম।

এ ধরনের গবেষণায় ঝুঁকি ও সমস্যা থাকে। গ্রামের মানুষকে সরাসরি প্রশ্ন করে বৈষম্য সম্পর্কে ঠিক উত্তর পাওয়া যায় না। এজন্য প্রয়োজন দীর্ঘমেয়াদি পর্যবেক্ষণ। রীতা দাস রায় এবং আরও কয়েকজন মাঠ গবেষক এই কাজের দায়িত্ব নেন। তারা প্রতিদিন ভোর থেকে রাত পর্যন্ত নির্দিষ্ট বাড়িগুলোতে সার্বক্ষণিক অবস্থান করে দেখতেন, খাবার বন্টনের ক্ষেত্রে ছেলে ও মেয়ের প্রতি কীরকম আচরণ করা হচ্ছে।

সার্বক্ষণিক অবস্থান করে দেখা গেল, ব্র্যাকের কার্যক্রমের ফলে কিছু ক্ষেত্রে পরিবর্তন এসেছে। গবেষকরা দেখলেন, যেসব গ্রামে ব্র্যাকের কার্যক্রম রয়েছে সেখানে ছেলে ও মেয়েকে সমপরিমাণ খাবারই দেওয়া হচ্ছে। এখানে কোনো বৈষম্য চোখে পড়েনি। কিন্তু কিছু ক্ষেত্রে বৈষম্য রয়েই গেছে।

বাঙালি পরিবারে বড় মাছের মাথা একটি 'এক্সটিক' এবং তা সকলেরই প্রিয় খাবার। পরিবারের সবচাইতে প্রভাবশালী এবং গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির জন্য তা নির্ধারিত থাকে। রীতা রায় দেখলেন, ছেলেদের সমপরিমাণ খাবার মেয়েদেরও দেওয়া হচ্ছে সত্য, কিন্তু মাছের মাথা পাচ্ছে ছেলেরা। মেয়েরা তা পাচ্ছে না। এই গবেষণার উপসংহার হলো ব্র্যাকের কাজ কিছু ক্ষেত্রে পরিবর্তন এনেছে ঠিকই, কিন্তু যেসব চর্চা বা রীতি আমাদের সংস্কৃতির রন্ধ্রে রন্ধ্রে গেঁথে আছে, তা পরিবর্তন করা সময়সাপেক্ষ। হয়তো এর জন্য অন্যকিছু প্রয়োজন।

ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমে যারা যোগদান করে তাদের মধ্যে কতভাগ সত্যিকার দরিদ্র তা নিয়ে অনেক আলোচনা ছিল। দেখা যেত অপেক্ষাকৃত অবস্থাপন্ন কিছু লোক ক্ষুদ্রঋণের সুযোগ নিত। হাসান জামানের গবেষণা থেকে দেখা গেল মতলবে এর হার ২৯ শতাংশ, যা অন্য এলাকার তুলনায় অনেক বেশি। ব্র্যাক ও গ্রামীণ ব্যাংকসহ অন্য প্রতিষ্ঠান যারা ক্ষুদ্রঋণ নিয়ে অনেকদিন ধরে কাজ করছে, তাদের কাছে ক্ষুদ্রঋণ হলো দারিদ্র্য দূরীকরণের একটি হাতিয়ার। এখন অবশ্য সেই উদ্দেশ্য একটু অন্যভাবে বলা হচ্ছে। আর্থিক অন্তর্ভুক্তি বা ফাইন্যান্সিয়াল ইনক্লুশন। আজকাল ক্ষুদ্রঋণকে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের অর্থনৈতিক স্বাধীনতার হাতিয়ার হিসেবেও বিবেচনা করা হচ্ছে। উদাহরণস্বরূপ, অর্থনৈতিকভাবে ব্র্যাক এখন প্রায় আশিভাগ স্বনির্ভর, যার সিংহভাগই আসছে ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি থেকে।

নারীর ক্ষমতায়নে ক্ষুদ্রঋণের প্রভাব নিয়ে অনেক গবেষণা হয়েছে। শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন নারীর ক্ষমতায়নের একটি মাপকাঠি। মতলবে নিবিড় গবেষণায় মাহমুদা খান দেখতে পান, যেসব খানায় ক্ষুদ্রঋণ গ্রহীতা সদস্য আছেন সেগুলোতে নির্যাতনের হার পঞ্চাশভাগ বেশি। কিন্তু এটি তো হবার কথা নয়! ব্র্যাক নারীদের সহায়তা করতে গিয়ে তাদেরকে আরও বিপদে ফেলছে? মাহমুদা বিশ্লেষণ করে দেখলেন, নির্যাতনের হার নির্ভর করে নির্যাতিত নারীর ব্র্যাকের সদস্য হিসেবে সম্পৃক্ত থাকার সময়ের ওপর (লেংথ অব মেম্বারশিপ)। যত বেশি সময় সম্পৃক্ততা নির্যাতন তত কম।

বাংলাদেশের পুরুষশাসিত সমাজে টাকা-পয়সা সবসময় পুরুষের পকেটেই থাকে। এজন্যই শাড়ির মধ্যে হয়তো পকেট দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা কখনও অনুভূত হয়নি! এই প্রথা ভেঙ্গে যখন ক্ষুদ্রঋণের টাকা চলে এলো নারীর কাছে, তখন পরিবারের মধ্যে ভারসাম্যহীনতা তৈরি হলো।

বাংলাদেশের পুরুষশাসিত সমাজে টাকা-পয়সা সবসময় পুরুষের পকেটেই থাকে। এজন্যই শাড়ির মধ্যে হয়তো পকেট দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা কখনও অনুভূত হয়নি! এই প্রথা ভেঙ্গে যখন ক্ষুদ্রঋণের টাকা চলে এলো নারীর কাছে, তখন পরিবারের মধ্যে ভারসাম্যহীনতা তৈরি হলো। পুরুষদের পক্ষে তা মানা কঠিন হয়ে গেল। যার অবধারিত পরিণতি হলো নির্যাতন। মতলবে ঠিক তা-ই দেখা গিয়েছিল।

পুরুষরা এক সময় উপলব্ধি করতে থাকে যে, নারীরা ক্ষুদ্রঋণের টাকা পরিবারের কাজেই ব্যবহার করছে। এর ফলে তাদের মধ্যে সৌহার্দ বাড়ে এবং নির্যাতন কমে। আরেকটি বিষয়ও কাজ করেছে, তা হলো ব্র্যাকের উপস্থিতি। ব্র্যাকের শক্ত অবস্থান অনেক নারীকে পুরুষের বিরূপ আচরণের হাত থেকে রক্ষা করতে সহায়তা করেছে। সৈয়দ মাসুদ আহমেদও তার এক গবেষণায় একই ধরনের চিত্র খুঁজে পেয়েছিলেন।

মাসুমা খাতুন পুষ্টি নিয়ে অনেক গবেষণা করেছেন। মতলবে প্রথম দিকে মেয়েদের খর্বতা বা স্টান্টিং-এর হার ছেলেদের চাইতে বেশি ছিল। কয়েক বছরেই সেটা দূর হয়ে যায়। যে পরিবারে ব্র্যাকের সদস্য ছিল সে পরিবারে এই হার ছেলেদের সমান হয়ে যায়। মহিলা বিশেষত যারা দরিদ্র, তারা নানা ধরনের মানসিক অশান্তি বা মনোরোগে ভোগেন। সৈয়দ মাসুদ আহমেদসহ অন্য গবেষকরা মতলবে মনোরোগের ওপর বেশ কিছু গবেষণা করেছিলেন। বলা হয়, নানা ধরনের উন্নয়ন কর্মকাণ্ড বিশেষ করে ক্ষুদ্রঋণ নারীদের মধ্যে এই মানসিক অশান্তি (ডিপ্রেশন) বা মনোরোগের উত্থান ঘটায়।

মতলবে ব্র্যাকের কার্যক্রম শুরুর কয়েক মাসের মধ্যে পরিচালিত এক নিরীক্ষায় দেখা গেল যে, মনোরোগ দরিদ্রদের মধ্যেই বেশি। কিন্তু ব্র্যাকের কার্যক্রম এ থেকে উত্তরণে তেমন কোনো অবদান রাখতে পারেনি। ইদানীং ব্র্যাক তার কার্যক্রম বিশেষ করে রোহিঙ্গাদের কার্যক্রমে মানসিক স্বাস্থ্য বিষয়ে জোর দিচ্ছে। সৈয়দ মাসুদ আহমেদ এই কার্যক্রমের ওপরে লেখালেখি করেছেন। অসুস্থ হলে মানুষ কী ধরনের চিকিৎসা নেয় তা নিয়ে বেশ কয়েকটি প্রবন্ধ তিনি লিখেছেন। দেখা গেছে, ব্র্যাকের কাজের ফলে চিকিৎসাক্ষেত্রে জেন্ডারসমতা এসেছে। নারীরা এখন পুরুষদের মতোই সমভাবে চিকিৎসকের শরণাপন্ন হচ্ছেন। এও দেখা গেছে, অনেকেই নিজের চিকিৎসা এখন নিজেই করছেন। যার কোনো যুক্তিগ্রাহ্য কারণ খুঁজে পাওয়া যায়নি।

ব্র্যাক ও আইসিডিডিআর,বি মতলব গবেষণা প্রকল্পের উল্লিখিত বিষয় এবং নতুন নতুন চিত্তাকর্ষক গবেষণা উপহার দিয়ে উন্নয়ন জ্ঞানকে করেছে সমৃদ্ধ। সমাজের পিছিয়েপড়া শিশুদের জন্যই ব্র্যাকের উপানুষ্ঠানিক স্কুল। বাংলাদেশে বিদ্যালয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে বর্তমানে ছেলে ও মেয়ের হারে সমতা এসেছে। সমসংখ্যক ছেলেমেয়ে প্রাথমিক শিক্ষায় অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে। দেশের জন্য এটি একটি বিরাট অর্জন। বলতে দ্বিধা নেই, ব্র্যাকের হাজার হাজার স্কুল এই অর্জনে বিশেষ ভূমিকা রেখেছে। ব্র্যাকের স্কুলে সত্তরভাগ পড়ুয়াই মেয়ে এবং শিক্ষকরাও নারী। এর উদ্দেশ্য হলো শিক্ষাক্ষেত্রে পিছিয়েপড়া মেয়েদেরকে উন্নয়নের সামনের সারিতে নিয়ে আসা। অনেকটা ‘পজিটিভ ডিসক্রিমিনেশন’। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক প্রেসিডেন্ট জন এফ কেনেডির ভাষায় ‘অ্যাফারমেটিভ অ্যাকশন’।

ব্র্যাককর্মীদের মধ্যে যারা এসব স্কুল তদারকির দায়িত্বে রয়েছে, তাদের মনেও এই চিন্তা সবসময় ঘুরপাক খায়। স্বভাবতই আশা করা যায়, ব্র্যাকের স্কুলে মেয়েদের প্রতি বৈষম্য হয়তো হবে না। কিন্তু যে বৈষম্য আমাদের সংস্কৃতি ও জীবনের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ঢুকে গেছে তার মূলোৎপাটন কী অতি সহজেই করা যাবে?

একবার গবেষকদের একটি দল উল্লিখিত বৈষম্যের উপস্থিতি অবলোকন করছিলেন। সেই একই পদ্ধতি। সারাদিন ধরে ক্লাসরুমের পেছনে বসে নিবিড় পর্যবেক্ষণ। গবেষকদের চোখে তেমন কোনো বৈষম্য ধরা পড়ল না। তবে একটি বিষয় দেখে তাদের কিছুটা খটকা লাগল। পাঠশেষে শিক্ষক যখন কোনো প্রশ্ন করছেন, তা প্রথমেই করছেন ছেলেদের এবং পরে মেয়েদের। সমাজবিজ্ঞানীদের বিশ্লেষণ হলো এটাও এক ধরনের গূঢ় বৈষম্য। কীভাবে মনের অজান্তেই শিক্ষক প্রথমেই প্রশ্ন করছেন ছেলেদের। তিনি নিশ্চিত হতে চান যে, ছেলেরা বিষয়টি রপ্ত করেছে। এটি ইন্সটিঙ্কট বা সহজাত প্রবৃত্তি। প্রশ্ন হলো, এটি কী আমাদের সংস্কৃতির একটি অমোচনীয় দিক?

ব্র্যাকের কাজের ফলে চিকিৎসাক্ষেত্রে জেন্ডারসমতা এসেছে। নারীরা এখন পুরুষদের মতোই সমভাবে চিকিৎসকের শরণাপন্ন হচ্ছেন।

নব্বই দশকের মাঝামাঝি সময়ে ব্র্যাকের বিরদ্ধে এক ধরনের ‘জিহাদ’ ঘোষণা করে একটি উগ্রবাদী ইসলামী গোষ্ঠী। এরই প্রভাবে নানা জায়গায় ব্র্যাকের স্থাপনার ওপর আঘাত আসে। মতলব ছিল এই জায়গাগুলোর মধ্যে প্রথম। ওখানে অনেকগুলো ব্র্যাক স্কুল পুড়িয়ে দেওয়া হয়। গবেষণাকর্মীরা মাঠে উপস্থিত থাকায় এই বিষয়ে বিশদ জানার সুযোগ হয়। আমরা বুঝতে পারলাম যে, এটা ব্র্যাকের বিরুদ্ধে এলাকার নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া বা ব্যাকল্যাশ। ব্র্যাক গ্রামে গ্রামে নারীর ক্ষমতায়নে কাজ করে। ব্র্যাকের ক্ষুদ্রঋণ শুধু নারীদের জন্য এবং স্কুলের শিক্ষকদের সকলেই নারী। এর বিপরীতে ব্র্যাককর্মীদের সিংহভাগই পুরুষ। তারা বাড়ি বাড়ি গিয়ে নারীদের সঙ্গে যোগাযোগ করে নানা কার্যক্রমে উদ্বুদ্ধ করেন।

নব্বই দশকের মাঝামাঝি সময়ে ব্র্যাকের বিরদ্ধে এক ধরনের ‘জিহাদ’ ঘোষণা করে একটি উগ্রবাদী ইসলামী গোষ্ঠী। এরই প্রভাবে নানা জায়গায় ব্র্যাকের স্থাপনার ওপর আঘাত আসে। মতলব ছিল এই জায়গাগুলোর মধ্যে প্রথম।

গ্রামে স্থানীয় পুরুষদের সংশ্লিষ্টতা খুবই সীমিত। এ কারণে ব্র্যাকের প্রতি অজানা সন্দেহ ও ক্ষোভ দানা বাঁধতে থাকে এবং তা ছড়িয়ে পড়ে। তারা ভাবে, ব্র্যাক কী করছে? এই শূন্যতার সুযোগ নেয় কিছু উগ্রবাদী ইসলামী গোষ্ঠী। তারা প্রচার করে, ব্র্যাক গ্রামের নারীদের খ্রিস্টান বানানোর চেষ্টা করছে। ব্র্যাক স্কুলে কোনো ধর্মীয় বিষয় পড়ানো হয় না। তারা এটাকে অজুহাত হিসেবেও নেয়। এর ফলে সহজ টার্গেট হিসেবে ব্র্যাক স্কুল আক্রান্ত হয়। এই নতুন গবেষণালব্ধ জ্ঞান ব্র্যাক কাজে লাগায়। ব্র্যাকের কাজে পুরুষদের সংশ্লিষ্টতা বাড়ানো হয় এবং ব্র্যাক স্কুলে পুরো সরকারি পাঠ্যক্রম বা কারিকুলাম অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

আইসিডিডিআর,বি-র ডেমোগ্রাফিক সার্ভেইল্যান্স-এর কথা আগেই বলেছি। চার সেল ডিজাইন কাজে লাগিয়ে আমরা চেষ্টা করি কীভাবে ব্র্যাকের উন্নয়ন কর্মসূচির প্রভাব মাপা যায়। আমাদের উদ্দেশ্য ছিল স্বাস্থ্যের ওপর প্রভাব নির্ণয় করা। চুলচেরা বিশ্লেষণে দেখা গেল, যেসব গ্রামে ব্র্যাকের কর্মসূচি রয়েছে সেখানে শিশুমৃত্যুর হার যেখানে ব্র্যাক অনুপস্থিত তার চাইতে প্রায় বিশ শতাংশ কম। এর মাধ্যমে প্রমাণিত হয় যে, উন্নয়ন কর্মকাণ্ড তথা ক্ষুদ্রঋণ ও প্রাথমিক শিক্ষা প্রশ্নাতীতভাবে স্বাস্থ্যের জন্য সহায়ক। প্রশ্ন থেকে যায়, এই প্রভাবের মেকানিজমটা কী? কেনইবা এই প্রভাব ঘটে? অর্থাৎ ক্ষুদ্রঋণ বা ব্র্যাক স্কুল কীভাবে শিশুমৃত্যুর হারের ওপর প্রভাব ফেলতে পারে? আমাদের গবেষকরা এ বিষয়েও বিস্তারিত বিশ্লেষণ করেছেন।

২০০৫ সালে ব্র্যাক ও আইসিডিডিআর,বি একটি প্রকাশনার মাধ্যমে যৌথ প্রকল্প থেকে পাওয়া ফলাফল গভীরভাবে বিশ্লেষণ করে। প্রকাশনার একটিই উদ্দেশ্য ছিল। আর তা হলো মেকানিজমের বিষয়ে বিশদ আলোচনা করা। একটি কাঠামো বা ফ্রেমওয়ার্কের মাধ্যমে এই মেকানিজম তুলে ধরা হয়েছিল। ক্ষুদ্রঋণের সঙ্গে জড়িত হয়ে নারীরা একাধারে তাদের আয় বাড়িয়েছেন এবং সঙ্গেসঙ্গে পরিবারে তাদের অবস্থানও শক্ত হয়েছে। পরিবার এবং বৃহত্তর সমাজে তাদের প্রতি অবহেলা কমেছে। ক্ষুদ্রঋণে অংশ নিয়ে তারা বাইরের পৃথিবীর সঙ্গে যোগাযোগ তৈরি করতে পেরেছেন। এর ফলে তাদের বৈশ্বিক জ্ঞান, ধ্যান-ধারণা এবং উচ্চাকাঙ্ক্ষা বেড়েছে। তারা তাদের ছেলেমেয়েদের বেশি করে যত্ন নিতে পারছেন এবং নিজেদের প্রতিও বেশি বেশি খেয়াল রাখছেন। দেখা গেছে, যেসব গ্রামে ব্র্যাকের কর্মসূচি রয়েছে সেখানে শিশুদের পুষ্টির অবস্থাও ভালো এবং তারা আধুনিক চিকিৎসা পদ্ধতিতে বেশি মনোযোগী। শিশুমৃত্যুর হারে ব্র্যাকের গ্রামগুলোতে ধনী-দরিদ্রের বৈষম্য প্রায় চলে গেছে। যারা ব্র্যাক সদস্য তাদের শিশুদের মৃত্যুহার কমে একই গ্রামের ধনীর ঘরের শিশুদের মৃত্যু হারের সমান হয়েছে। এটি বিশাল অর্জন।

ব্র্যাক এবং আইসিডিডিআর,বি-র যৌথভাবে চালানো প্রকল্প থেকে অন্তত দুই ডজন গবেষণা প্রবন্ধ নানা আন্তর্জাতিক সাময়িকীতে স্থান পেয়েছে। এই যুগান্তকারী প্রকল্পে যেসব গবেষক তাদের পদচিহ্ন রেখেছেন এবং অন্য যারা নানাভাবে সহায়তা করেছেন, তাদের সকলের প্রতি রইল কৃতজ্ঞতা ও অভিনন্দন।

কৃতজ্ঞতা : আব্বাস ভূইয়া ও সৈয়দ মাসুদ আহমেদ

আমার ব্র্যাক জীবন